চতুর্থ সেমিস্টার SEC 2

পত্র রচনা ও প্রতিবেদন রচনা

স্টাডি মেটেরিয়াল

পত্র-রচনা

'চিঠি লেখারও একটা আর্ট আছে—সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা উচিত হয় না। ...চিঠি লেখার উপলক্ষ্যে নিজের স্বগত উক্তিকে সুব্যক্ত ও পরিস্ফুট করে তোলবার ইচ্ছে হয়।'
—রবীন্দ্রনাথ

প্রস্তাবনা

পত্র-রচনা মানুষের ভাবপ্রকাশের অন্যতম প্রধান বাহন। কথা ও ভাষা প্রয়োগের দ্বারা যেমন মানুষ তার মনের ভাবকে প্রকাশ করে; তেমনি মানুষ লেখার দ্বারা মনের ভাবকে ব্যক্ত করে। লেখার দ্বারা এইভাবে কখনো সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং সাহিত্য-রূপের দ্বারা সেই ব্যক্ত ভাব চিরন্তনত্ব লাভ করে। পত্র রচনায়ও অনুরূপভাবে ভাষার সাহায্যে, মনের ভাব প্রকাশিত হয় এবং তা স্থায়ী মূল্য লাভ করে।

প্রাচীন কালের পত্র-রচনা

পত্র লেখার ইতিহাস কবে শুরু হয়েছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে সম্ভবতঃ প্রয়োজনের তাগিদেই প্রথম পত্র রচনার উদ্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালে পত্র রচনা কেবল প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; নিছক প্রয়োজনের গণ্ডী অতিক্রম করে অপ্রয়োজনের আনন্দে ও ব্যক্তিগত সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। প্রাচীনকালের কাব্যে, নাটকে যেমন বিস্তর পত্র রচনার উল্লেখ আছে, তেমনি ইতিহাসের নানা ঘটনাবলীতে পত্র রচনার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পত্র রচনার রীতিও পরিবর্তিত হয়েছে। লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এতে প্রধানভাবে সাহায্য করেছে; তেমনি সাহায্য করেছে কাগজ, কলম, কালি প্রভৃতির আবিষ্কার। পূর্বকালে ডাক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না ; তখন অবশ্য অন্যভাবে পত্র পাঠানোর রীতি প্রচলিত ছিল। কখনো সৈনিকের মারফৎ পত্র প্রেরণ করা হত, কখনো বা গোষ্ঠী-নেতার মারফৎ পত্র প্রেরণ করা হত। প্রাচীন কাব্য প্রভৃতিতে কপোত, হংসপদিকা প্রভৃতির মুখে পত্র পাঠানোর রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে শেরশাহ প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন; অবশ্য তার পূর্বেই ডাকের প্রচলন হয়েছিল। প্রাচীনকালের চিঠিপত্রে বর্তমানের মত এত কৌশল থাকত না ; কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় কথাটুকু কখনো সংকেতে কখনো বা সংক্ষেপে ব্যক্ত করে চিঠিতে লেখা হত। ফলে উপকরণের দৈন্য যেমন থাকত, তেমনি ভাষা, কারুকর্ম, আঙ্গিক-প্রকরণ প্রভৃতিতেও সাধারণ ভঙ্গি থাকত।

নূতন কালের ভঙ্গী

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিঠিপত্রেরও রূপান্তর সাধিত হয়েছে। নানাবিধ উপকরণ আবিষ্কৃত হওয়ায় চিঠিপত্রকে নানাভাবে সাজানোর চেষ্টা হয়েছে। কখনো আঙ্গিকের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, কখনো ভাষার কারুকর্ম, কখনো বা বিষয় বিন্যাসের ক্ষেত্রে নানাবিধ পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। পুরাতন আঙ্গিক ও উপকরণ পরিত্যাগ করে নূতন আঙ্গিক ও উপকরণ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্বোধন বা সম্ভাষণের রীতি পরিবর্তিত হয়েছে। এমন কি বক্তব্য প্রকাশের কৌশলেরও আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে পূর্বে যেখানে চিঠিপত্র লেখা সাধারণভাবে ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করত, বর্তমানকালে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান বা বিনিময় সামাজিক দায়িত্ব বা কর্তব্যবোধের অঙ্গীভূত হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে আইনগত বিধি বিধানেরও আওতায় এসে পড়েছে। সুতরাং বর্তমানকালে চিঠিপত্র লেখা কেবলমাত্র ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের উপরই কেবল নির্ভর করে না।

সাধারণভাবে চিঠিপত্রকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। (১) **ব্যক্তিগত পত্র** (Personal letters), (২) **সামাজিক পত্র** (Social letter), (৩) **বৈষয়িক বা ব্যবহারিক পত্র** (Official letters) ও (৪) **ব্যবসায়িক পত্র** (Commercial and Business letters)।

পত্রের শ্রেণীবিভাগ

১. ব্যক্তিগত পত্র (Personal letters) ঃ ব্যক্তিগত বিষয় কিংবা একান্ত নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে যে সকল পত্র রচিত হয়, সেগুলিকে ব্যক্তিগত পত্রের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। এগুলি কখনও প্রয়োজন উপলক্ষ্যে রচিত হয়; কখনো বা নিছক অপ্রয়োজনে লিখিত হয়। তবে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে লেখা পত্রে পারিবারিক প্রসঙ্গ থাকতে পারে ; সেজন্য পারিবারিক পত্রকে ব্যক্তিগত শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত করা হয়ে থাকে।

২. সামাজিক পত্র (Social letters) ঃ সামাজিক উৎসব, পূজা-পার্বণ, অনুষ্ঠান প্রভৃতি উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করে যা উক্ত প্রসঙ্গে তথ্য জ্ঞাপন করে যে সকল পত্র লেখা হয়, সেগুলিকে সামাজিক পত্রের অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

৩. বৈষয়িক বা ব্যবহারিক পত্র (Official letters) ঃ অফিসের কাজকর্ম সংক্রান্ত বিষয়, চাকুরি, ছুটি প্রভৃতি অথবা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা বা আবেদন জানিয়ে চিঠিপত্র লিখিত হলে তা বৈষয়িক বা ব্যবহারিক পত্রের পর্যায়ে পড়ে। সংবাদপত্রে মুদ্রণের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখিত পত্রও এই পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত।

৪. ব্যবসায়িক পত্র (Commercial and Business letters) ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সংবাদ ও তথ্য প্রভৃতি জ্ঞাপন করে কিংবা ক্রেতা ও বিক্রেতার কোন প্রশ্নের উত্তর প্রভৃতি উল্লেখ করে যে সকল পত্র লিখিত হয়, সেগুলিকে ব্যবসায়িক পত্র বলা হয়। কোন বিষয়ের অনুসন্ধান করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করাও এই শ্রেণীর পত্রের অর্ন্তভুক্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের এজেন্সী প্রার্থনা, নূতন ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় পত্র, তথ্য-জ্ঞাপক বিষয় সম্বলিত চিঠি এই শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত।

পত্রের ভাবভঙ্গী

পূর্বে বিভিন্ন শ্রেণীর পত্রের মধ্যে ভাষাভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষিত হত। অবশ্য এখনো ব্যক্তিগত পত্রের ভাবভঙ্গীতে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়; অন্যান্য শ্রেণীর পত্রের ভাষাভঙ্গীর মোটামুটি একটা আদল বা ধাঁচ তৈরি করা আছে। অল্পস্বল্প পরিবর্তন সাপেক্ষে এই ধরনের চিঠিপত্র লেখা হয়। ভাষাভঙ্গীর দিক থেকে এগুলির প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য—(১) প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা, (২) সহজবোধ্যতা ও স্পষ্টতা, (৩) বিনয়-নম্রতা ও অকপট প্রকাশ-ভঙ্গী।

এছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয় ঃ

(১) পত্রের ভাষা হবে যথাসম্ভব সহজ ও সরল।

(২) যথাসম্ভব সংক্ষেপ করে পত্রের বিষয় লিখতে হবে।

(৩) অনেকগুলি বিষয় একটি চিঠিতে না লেখাই বাঞ্ছনীয়।

(৪) একাধিক বিষয় থাকলে একটির সঙ্গে অন্যটির সঙ্গতি রাখতে হবে এবং বিষয়গুলিকে পরম্পরা অনুযায়ী সাজাতে হবে।

(৫) বাক্য যেন অযথা দীর্ঘ না হয়; সরল বাক্যের প্রয়োগে বিষয়বস্তু সহজে প্রকাশ লাভ করে।

(৬) এক কথা বারংবার না বলাই ভাল; পুনরুক্তিদোষ পরিহার করা একান্তই প্রয়োজন। এতে পত্রের বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য বাড়ে।

(৭) অযথা কঠিন শব্দের প্রয়োগ ক্লান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়।

(৮) বানান ভুল ও বাক্যগঠনে অশুদ্ধি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

(৯) অযথা বিনয় প্রকাশেও পত্রের গাম্ভীর্য ব্যাহত হয়।

(১০) আবেগ ও উচ্ছ্বাস অবশ্যই বর্জনীয়। ব্যক্তিগত পত্রে কিছুটা আবেগ ও উচ্ছ্বাসের স্থান থাকলেও তা মাত্রাতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়।

(১১) পত্রের প্রতিটি বিষয় পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে (Paragraph) উল্লেখ করা ভাল।

(১২) অনুচ্ছেদগুলিতে যতি প্রকরণ (Punctuation marks) যেন ঠিকভাবে থাকে।

(১৩) পত্র রচনার সব ক'টি রীতি যেন মেনে চলা হয়। অর্থাৎ পত্রের ভিতরের ও বাইরের অংশ যেন ঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়।

(১৪) সমগ্র পত্রটি যেন এমনভাবে লেখা হয়, যাতে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অক্ষর, ভাষা প্রভৃতি অস্পষ্ট থাকলে পত্র-প্রাপকের পক্ষে অর্থ উপলব্ধি করা অনেক সময় অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়।

(১৫) সমগ্র পত্রটি এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে, যাতে তা পরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও সুদৃশ্য হয়।

(১৬) ব্যক্তিগত পত্র রচনায় কিছুটা স্বাধীনতা আছে; অন্য শ্রেণীর পত্র রচনায় বক্তব্য বিষয় প্রকাশের স্বাধীনতা কম।

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে পত্ররচনার উপর

একটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে যে সকল উপাদানের উপর, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান এই চিঠিপত্র। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে এগুলির গুরুত্ব ও প্রভাব কোন অংশে কম নয়। তাই অন্যান্য বিষয়ের মতই চিঠিপত্রের বিষয়বস্তু, ভাষাপ্রয়োগ, আঙ্গিক সৌষ্ঠব-রীতি প্রভৃতির পূর্ণতার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর যাতে সার্থক পত্র রচনা করা যায়, তার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর পত্রের সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অংশে। এছাড়া বিভিন্ন আঙ্গিকের পত্র রচনার নমুনা দেওয়া হয়েছে;— এগুলির দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা অনুপ্রাণিত হতে পারে বিভিন্ন শ্রেণীর পত্র রচনার উৎকর্ষতা নিরূপণের মাধ্যমে।

শেষকথা

দৈনন্দিন জীবনে পত্রের ভূমিকা আজ গুরুত্বপূর্ণ। আগেকার দিনে মুখের কথায় কাজ হত; আজকাল আর মুখের কথায় কাজ হয় না—সব কিছুর লিখিত বিবরণ রাখতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কিংবা অফিস-আদালত প্রভৃতির কাজকর্মসংক্রান্ত সমস্ত কিছু বিষয় লিখিতভাবে আদান-প্রদান করতে হয়। এই লিখিতভাবে আদান-প্রদানের মুখ্য মাধ্যম চিঠিপত্র। এই কারণে চিঠিপত্রের ভূমিকা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। এছাড়া দূর-দূরান্তস্থিত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান কিংবা অফিস ও সরকারী কাজকর্ম বিষয়ে লিখিত পত্র বিরাট এক যোগসূত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে তথ্য ও বিষয়ের পরিবেশন, ভাবের আদান-প্রদান আজ মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে যে অনেকখানি সহায়তা করেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

● ব্যক্তিগত পত্র ঃ

"আমরা যে মূর্তি গড়িতেছি, ছবি আঁকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি... ইহা আর কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।"

মানুষ যেমন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায়, তেমনি আবার সকলের সঙ্গে ভাবের যোগে মিলিত হতে চায়। এই মিলনের অন্যতম উপায়—পত্রযোগে ভাব-বিনিময়। কখনো প্রয়োজনের তাগিদে পত্র লিখতে হয়, কখনো বা নিছক কুশল-সংবাদ বিনিময়ের জন্য পত্র লিখতে হয়; কখনো বা নিজের অন্তরের কথাটিকে অন্যের কাছে প্রকাশের জন্য চিঠিপত্র লিখতে হয়। এই সমস্ত চিঠিপত্র লেখাকে সামাজিকতার বিষয় বলে মনে করা হয়; এবং এগুলির মধ্য দিয়ে এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিছক ব্যক্তিগত ভাবকে প্রকাশের জন্য লেখা চিঠিপত্রকে 'ব্যক্তিগত পত্র'-এর পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

সূচনা

ব্যক্তিগত পত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির প্রকাশ; ব্যক্তি যেন নিজেকে উজাড় করে দিয়ে ব্যক্ত করতে চায়। এই ধরনের পত্রে দুটি মানুষ বা দুটি চরিত্র উপস্থিত। একজন হলেন পত্র-লেখক ; অপরজন হলেন পত্র-প্রাপক। পত্র লেখার সময় পত্রের মধ্য দিয়ে সেই দূরের মানুষ পত্র-প্রাপকের উপস্থিতিকে মনশ্চক্ষে কল্পনা করে তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে। এইভাবে মন খুলে কথা বলার সময় অনেক সময় পত্রের ভাষা আবেগপূর্ণ ও শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠে ; কখনো কখনো কাব্যময় হয়ে ওঠে। ইটালীয় কবি ওভিদ এইভাবে শিল্পমণ্ডিত যুগান্তকারী কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর 'Heroic Epistles'-এ। তাঁর ঐ কাব্যের প্রতিটি পত্র যেন হয়ে উঠেছে 'Dramatic Monologue'। এখানে একজন কথা বলে যাচ্ছেন আপন মনে; আর সেই আপন মনের ছন্দ ধরা পড়েছে চিরন্তন সাহিত্যের শিল্পশ্রীতে। বাংলায় এই ধরনের পত্র-সাহিত্য কিছু কিছু রচিত হয়েছে—এগুলির মধ্যে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য', রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্ন-পত্রাবলী' প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈশিষ্ট্য

ব্যক্তিগত পত্র সকল সময় আবেগপূর্ণ ও শিল্পমণ্ডিত হয় না। নিছক প্রয়োজনের ভিত্তিতে লেখা কিংবা কুশল সংবাদ বিনিময়ের জন্য লেখা পত্রের ভাষা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। সেখানে আবেগের চেয়ে প্রয়োজন বড় হয়ে দেখা দেয়। প্রয়োজনভিত্তিক চিঠিপত্রে মনের ভাব অপেক্ষা সংবাদ বা তথ্য বেশি ভূমিকা নেয়—কারণ সেখানে পত্র-প্রাপকের নিকট সেগুলির মূল্য এবং গুরুত্ব বেশি। তবে এই শ্রেণীর পত্রেও আন্তরিকতা প্রকাশের কিংবা ভাব-বিনিময়ের সুযোগ থাকে ; তবে তা গুরুত্ব পায় না বলে সেখানে সাহিত্যের স্বাদ গড়ে উঠে না।

অনেক সময় দার্শনিক বিষয়, আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রভৃতি ব্যক্ত করে পত্র লিখিত হয়। পৃথিবীর অনেক মনীষীর পত্র এই সমস্ত বিষয় অবলম্বনে রচিত হয়ে অমর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বানার্ড শ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রমুখ অনেকের চিঠিপত্র ভাব ও ভাষার গুণে সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত।

ব্যক্তিগত পত্রের রচনারীতি মূলতঃ বৈঠকী মেজাজের; অর্থাৎ বৈঠকখানায় বসে যেন দুজনে দুজনের সঙ্গে কথা বলছেন। সেই মুখের কথাগুলি যেন কলমে লেখা হচ্ছে এবং লেখা সাঙ্গ করে ডাকঘরের মাধ্যমে কিংবা বাহকের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত পত্রটিতে ব্যক্তিগত ভাব ও ভাবনার পরিচয় থাকবে ; কিংবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথা থাকবে। পত্রের ভাষা হবে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত; নিজস্ব ভাবনার প্রকাশে ও দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

রচনারীতি

পত্র-রচনার কতকগুলি নির্দিষ্ট রীতি আছে; মোটামুটি ভাবে সকলকে সেই সকল সুনির্দিষ্ট রীতি মেনে চলতে হয়। তবে এই সকল রীতি এককালে গড়ে উঠেনি ; সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাব প্রকাশের রীতির যেমন পরিবর্তন হয়েছে অনেক, তেমনি পত্র রচনা-রীতিরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে ভাব ও ভাষার। বিভিন্ন সময়ে বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমানের চিঠি লেখার রীতিটি। সম্রাট আকবরের সময় কিংবা চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় যে ধরনের চিঠি লেখার নিয়ম ছিল, তা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে উনিশ শতকে রামমোহনের সময়। আবার রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সময় যেভাবে পত্র রচনার নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল, তা বর্তমানকালে অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। এমনি ভাবে নানা সময়ের ধারা বেয়ে বর্তমানের রীতিটি গড়ে উঠেছে।

ব্যক্তিগত পত্রের অংশ বিভাগ ঃ ব্যক্তিগত পত্রের প্রধান দুটি অংশ—(ক) ভিতরের অংশ। (খ) বাইরের অংশ। ভিতরের অংশ পত্র-লেখকের পরিচয়, মনের ভাব প্রভৃতি বিষয়ের প্রকাশ, বাইরের অংশে পত্র-প্রাপকের নাম, ঠিকানা প্রভৃতির পরিচয়।

(ক) ভিতরের অংশ ঃ ভিতরের অংশকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়— (১) শিরোনামা, (২) সম্ভাষণ, (৩) মূল পত্রাংশ, (৪) বিদায় সম্ভাষণ ও (৫) নাম-স্বাক্ষর।

১. শিরোনামা ঃ ব্যক্তিগত পত্রের শিরোনামায় প্রথমেই ঠাকুর দেবতার নাম অনেকে লিখে থাকেন। অনেকে আবার ঠাকুর দেবতার নাম লেখাকে 'সেকেলে প্রথা' মনে করে বাদ দিয়ে থাকেন। এটি নির্ভর করে ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর। যদি কেউ ঠাকুর দেবতার নাম লেখেন, তবে তিনি তা লেখেন পত্রের একেবারে মাথার উপরেই কিংবা কিছুটা বাম দিকে ঘেঁষে পত্রের উপরে।

শিরোনামার প্রধান অংশ পত্রলেখকের নাম, ঠিকানা ও তারিখ। পত্রের ডানদিকে মাথার উপর এগুলি সাধারণতঃ লিখতে হয়। প্রথমে পত্র-লেখকের ঠিকানা থাকবে এবং তার নিচেই থাকবে তারিখ। পত্রের কোন নম্বর থাকলে তার উল্লেখ বাম দিকের কোণে থাকাই বাঞ্ছনীয় (তবে কেউ কেউ ডান দিকে লিখে থাকেন)। নিচে শিরোনামা লেখার নমুনা দেখানো হল।

শহরের ঠিকানা

ফোন ঃ ৩৪৬-৪৭৩১

১৮, যদুলাল মল্লিক রোড
কলিকাতা-৭০০০১৯
১লা এপ্রিল, ১৯৮৬

দ্রষ্টব্য— তারিখ লেখার সময় পরিষ্কারভাবে তা লিখতে হবে ; কেবল কতকগুলি সংখ্যা পাশাপাশি লিখে তারিখ বোঝাতে গেলে তাতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে।

গ্রামের ঠিকানা

গ্রাম—বৃন্দাবনচক
পোঃ—শ্রীকণ্ঠা (ময়না); জেলা—মেদিনীপুর ৭০৩২৯১
২৫শে কার্তিক ১৪০২ (১২ই নভেম্বর, ১৯৯৫)

২. সম্ভাষণ ঃ যাকে উদ্দেশ্য করে পত্র লেখা হয়, সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে পত্রের শুরুতে সম্ভাষণ জানাতে হয়। পত্রের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা অনুযায়ী এই সম্ভাষণের ভাষা স্থিরীকৃত হয় এবং ব্যক্তিবিশেষে তা পরিবর্তিতও হয়। যেমন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে যেভাবে ও

যে ভাষায় সম্ভাষণ জানানো হয়, সম-বয়সী কিংবা কনিষ্ঠদের একটু পৃথক ভাষায় সম্বোধন বা সম্ভাষণ জানানো হয়। সম্প্রদায় বিশেষের মানুষদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন ধরনের সম্ভাষণ রীতি প্রচলিত। যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যে ভাষায় সম্ভাষণ করবেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ সে ভাষায় করবেন না—তার রীতি একটু পৃথক। আবার কখনো একই রীতি উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ব্যবহার করেন। লেখকের ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর অনেকটা নির্ভর করে। নিচে হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্ভাষণ বা সম্বোধনের রীতি এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্ভাষণের রীতি ও পার্থক্য প্রদর্শিত হল।

হিন্দুরীতি সম্ভাষণ ঃ

বয়োজ্যেষ্ঠ বা পূজনীয় আত্মীয় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে (পুরুষ) —শ্রীচরণেষু, শ্রীচরণ কমলেষু, পূজনীয়েষু, পূজ্যপাদেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু।

বয়োজ্যেষ্ঠা বা পূজনীয় আত্মীয়দের ক্ষেত্রে (স্ত্রীলোক) —শ্রীচরণেষু, শ্রীচরণকমলেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, পূজনীয়াসু।

দ্রষ্টব্য ঃ—'শ্রদ্ধাস্পদেষু' পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়দের ক্ষেত্রেই চলে। কারণ 'আস্পদ' শব্দটি যুক্ত হলে তার স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। সেক্ষেত্রে 'শ্রদ্ধাস্পদাসু' লেখা ভুল ও সঠিক শব্দ 'শ্রদ্ধাস্পদেষু', কিন্তু 'পূজনীয়েষু' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'পূজনীয়াসু' হয়।

বয়ঃ-কনিষ্ঠ বা ছোট স্নেহভাজনদের ক্ষেত্রে (পুরুষ)—কল্যাণীয়েষু, কল্যাণবরেষু, স্নেহভাজনেষু, পরম স্নেহভাজনেষু, স্নেহাস্পদেষু। (স্ত্রীলোক)—স্নেহাস্পদেষু, কল্যাণীয়াসু, চিরায়ুস্মতীসু।

সমবয়সীদের ক্ষেত্রে (পুরুষ) —প্রিয়বরেষু, সুহৃদ্বরেষু, বন্ধুবরেষু, প্রীতিভাজনেষু।

ঐ (স্ত্রীলোক) —সুপ্রিয়াসু, সুচরিতাসু, প্রীতিভাজনাসু।

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে (অনাত্মীয় গুরুজন পুরুষ) ঃ শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, মাননীয়েষু, অশেষ গুণান্বিতেষু।

ঐ (অনাত্মীয় গুরুজন স্ত্রীলোক) ঃ শ্রদ্ধাস্পদেষু, মাননীয়াসু।

স্বল্প-পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ঃ মাননীয়েষু, মান্যবরেষু, সম্মানীয়েষু।

মুসলমান রীতি অনুযায়ী সম্ভাষণ ঃ

আত্মীয় গুরুজন পুরুষদের ক্ষেত্রে ঃ 'পাকজনাবেষু', মোবারক জনাবেষু।

[সম্বোধন করার পরই লিখতে হবে 'আদাব তছলিমাতে হাজার হাজার বাদ আরজ']

অনাত্মীয় গুরুজন পুরুষদের ক্ষেত্রে ঃ 'পাকজনাবেষু', 'মোবারক জনাবেষু'।

[সম্বোধন করার পরই লিখতে হবে 'বহুত বহুত সেলাম বাদ আরজ']

পূজনীয়া স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে —'বখেদমতে হজরত মখদুমা মাছমা'; 'জনাব হজরত সোয়াজুমা'।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে—'মেহেরবানেষু,' ; বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে—'মেহেরবানেষু' ; স্নেহভাজন ও কনিষ্ঠদের ক্ষেত্রে—'আজিজল কদর বহুত পর'।

শিরোনামাসহ সম্ভাষণের নমুনা

হিন্দুরীতি

ওঁ

গ্রাম—কলসুর, পোঃ—কলসুর
জেলা—চব্বিশ পরগনা
৩রা এপ্রিল, ১৯৮৬

শ্রীচরণেষু,
পূজনীয় বাবা,
.....

মুসলমান রীতি

১৯, রমাকান্ত ঘোষ লেন
কলিকাতা—৭০০ ০৫৩
৩ রা এপ্রিল, ১৯৮৬

পাকজনাবেষু,
আদাব তছলিমাতে হাজার হাজার বাদ আরজ এই.....

৩. **মূল পত্রাংশ ঃ** পত্রের বক্তব্য বিষয় এই অংশে প্রকাশিত হয়। এই অংশটি সুন্দরভাবে ও সুবিন্যস্ত করে লেখার উপরই পত্রের প্রকৃত উৎকর্ষ নির্ভর করে। মূল বক্তব্য বিষয়ের প্রতিটি অংশ এক একটি অনুচ্ছেদে লিখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনুচ্ছেদ কতগুলি হবে এবং সেগুলির এক একটি কত বড় হবে, তার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে সাধারণভাবে তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত থাকে। প্রথম অনুচ্ছেদে—ভূমিকা। এই অংশে পত্র লেখার কারণ ও উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ—মূল প্রতিবেদন। এই অংশে প্রকৃত বক্তব্য বিষয় কিংবা আসল কথাটি প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ—লেখকের অভিপ্রায় বা প্রার্থনা। এই অংশে পত্র লেখার উদ্দেশ্য এবং পরবর্তী স্তরের জন্য লেখকের অভিপ্রায় বা প্রার্থনা প্রকাশিত হয়।

এই অংশটি সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ (১) মূল পত্রাংশ অনেকটা কথোপকথন ধর্মী হবে; যেন পত্র-লেখক ও পত্র-প্রাপক বসে আলাপরত।

(২) পত্র-লেখকের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার পরিচয়, আবেগময়তা ও অনুভূতির উষ্ণ স্পর্শ থাকবে।

(৩) ভাষা যেন সজীব হয়ে ওঠে—গুরুগম্ভীর শব্দের প্রয়োগে ভাষা যেন কৃত্রিম না হয়ে ওঠে।

(৪) আগাগোড়া স্বাভাবিক ধারায় থাকে—মাঝে মাঝে নাটকীয়তা থাকলে ভাল হয়।

৪. **বিদায় সম্ভাষণ বা উপসংহার ঃ** পত্রের মূল বক্তব্য লেখা শেষ হয়ে গেলে চিঠির শেষে ডানদিকে বিদায় সম্ভাষণ বা উপসংহার অংশটি থাকে। এটি থাকে পত্র-লেখকের নাম স্বাক্ষরের ঠিক উপরে। আমরা যেমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত কথাবার্তা শেষ করি এবং চলে আসার পূর্ব মূহূর্তে বিদায় সম্ভাষণ জানাই, ঠিক তেমনি পত্রের শেষে বিদায়ের পূর্ব মূহূর্তে

হিন্দু রীতি অনুযায়ী গুরুজনদের লেখার সময় লিখতে হয়—

'পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত.. শ্রীচরণ কমলেষু'

মুসলিম রীতি অনুযায়ী বড়-র কাছে ছোটদের পত্র লেখার সময়

'আরজদস্ত বখেদমত জনাব.... পাক জনাবেষু'—এইভাবে লিখতে হয়। চিঠির বাইরের অংশ সঠিকভাবে লেখার নমুনা দেওয়া হল।

ডাকটিকিট

প্রেরক ঃ
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
গ্রাম—বৃন্দাবনচক্
ডাকঘর—শ্রীকণ্ঠা (ময়না)
জেলা—মেদিনীপুর

প্রাপক ঃ
শ্রীবিকাশ চন্দ্র দত্ত
প্রযত্নে ঃ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দত্ত
গ্রাম—হরিনাভি
পোঃ—হরিনাভি
জেলা—চব্বিশ পরগনা ৭০০ ০৩৪

ডাকটিকিট

প্রেরক ঃ
ডঃ অনির্বান দত্ত
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রাপক ঃ
অধ্যাপক বিকাশ সান্যাল
ফ্ল্যাট ২, ব্লক ডি/৪
লাবণি আবাসন
ডাকঘর—বিধাননগর
কলিকাতা—৭০০ ০৬৪

● ব্যক্তিগত পত্র ●

(১) কলেজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে পিতার নিকট পুত্রের পত্র।

১২, গোপাল হালদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০০৬
২৩শে জুন, ১৯৮৬

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,
পূজনীয় বাবা,

আমাদের কলেজে প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছে গতকাল। এই দিনটি নানা কারণে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে এসে জীবনের একটা নূতন অধ্যায়ের সূচনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। আনন্দে, উৎসাহে, উদ্দীপনায় আমার সারাদিনটা কেটেছে।

আমাদের কলেজ সাধারণতঃ শুরু হয় সাড়ে দশটায়। আমি সাড়ে দশটা বাজার পনের মিনিট আগেই কলেজে যাই। কলেজের দরজায় গিয়ে আমাদের ক্লাসের রুটিনটা দেখতে পেলাম। প্রথমদিন আমাদের ক্লাস হচ্ছে বলে গতকাল আমাদের প্রথম ক্লাস এগারটায় শুরু হল। সকলের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে প্রথম ক্লাসে প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় নিজেই আসবেন এবং তাঁরই বক্তৃতা দিয়ে আমাদের ক্লাসের উদ্বোধন হবে।

যথাসময়ে ঘণ্টা বাজল; ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষে আসন গ্রহণ করলাম। আমরা অধিকাংশই শৃঙ্খলার সঙ্গে বসে সাগ্রহে অধ্যক্ষ মহাশয়ের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। মনের মধ্যে তখন কত প্রশ্ন—কত কৌতূহল—না জানি, তিনি কেমন মানুষ হবেন, দেখতে কেমন হবেন, আমরা কিরূপ আচরণ করব তাঁর সঙ্গে ইত্যাদি। কেবল চার পাঁচজন ছাত্র শ্রেণীকক্ষের বাইরের বারান্দায় পায়চারি করছিল। ওদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, ওরা যেন অধ্যক্ষ মশায়কে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করছিল। ঐ ছেলেদের হাবভাব আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছিল না। একটু পরেই অধ্যক্ষ মহাশয় এলেন; আমরা সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করলাম। তিনি সস্নেহে আমাদের আসন গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়ে নিজে বসলেন। সৌম্যদর্শন অধ্যক্ষ মশাই-এর প্রথম কথাটি শুনে আমরা অত্যন্ত অভিভূত হয়ে গেলাম! তিনি তাঁর বক্তৃতায় কলেজে নবাগত ছাত্রদের সকলকে স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানালেন। কলেজের নিয়ম-কানুনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন এবং বিশেষ করে শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়ার জন্য সকলকে নির্দেশ দিলেন। তাঁর একটি

কথা আমার মনে খুব দাগ কেটেছে। তিনি বললেন—বাড়িতে তোমার বাবা যেমন তোমার অভিভাবক, তেমনি কলেজে আমি তোমাদের অভিভাবক। কলেজটিকে নিজের মনে করে নিতে পারলে কোন সমস্যাই আর সমস্যা হয়ে দেখা দেবে না। এমনিভাবে তিনি আমাদের অনেক বিষয়ে উপদেশ দান করলেন। তাঁর বক্তৃতার সময় সারাক্ষণ সকলে আমরা একেবারে নীরব ছিলাম—মনে হচ্ছিল, মেঝেতে একটি পিন পড়লেও শব্দ হবে। ক্লাস শেষের ঘণ্টা বাজল ; অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের সকলকে আবার শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

দ্বিতীয় পিরিয়ডে এলেন ইংরেজির অধ্যাপক এন. সি. রায়। তিনি হাতে ক্লাস রেজিস্টার নিয়ে স্মিতহাস্যে আমাদের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলেন। আমরা সমবেতভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সম্ভ্রম ও সৌজন্য প্রদর্শন করলাম। তিনি সস্নেহে আমাদের আসন গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন এবং আমাদের সকলকে তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন। ক্লাস রেজিস্টার খুলে আমাদের সকলের রোল নম্বর এবং নাম ডাকতে লাগলেন। তিনি জানালেন প্রথম দিনের ক্লাস বলেই নাম ও রোল নম্বর দুই-ই তিনি ডাকছেন; পরদিন থেকে কেবলমাত্র রোল নম্বর ধরে ছাত্রদের ডাকা হবে এবং তার দ্বারাই উপস্থিতি নির্ণয় করা হবে। নাম ডাকার পর তিনি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে কলেজের নিয়মকানুন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানালেন। এর আগের ঘণ্টার ক্লাসে অধ্যক্ষ মহাশয় যে কথাগুলি বলেছিলেন, অধ্যাপক মহাশয় যেন সেগুলিরই পুনরাবৃত্তি করছিলেন। তবু তাঁর বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে যেন সেগুলি নূতন কথা হয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছিল।

তৃতীয় পিরিয়ডে এলেন বাংলার অধ্যাপক ডঃ সাধন মিত্র ; তিনি প্রথম রোলকল পর্ব শেষ করে আমাদের জানিয়ে দিলেন যে তিনি নজরুল ইসলামের কবিতা পড়াবেন। এই কথা বলে তিনি তাঁর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি পুরো আবৃত্তি করে গেলেন। আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম তাঁর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠের আবৃত্তি। মনে হচ্ছিল যেন কবি নজরুল তাঁর সমস্ত আবেগ-দীপ্ত বাণী নিয়ে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। বাংলা কবিতার যেন নূতন এক স্বাদ অনুভব করতে পারলাম তাঁর সেদিনকার আবৃত্তিতে।

সেদিন আরও দু'টি বিষয়ের অধ্যাপক মহাশয়গণ ক্লাসে এলেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্লাসে ছাত্রদের নাম ডেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা শুরু করলেন। আমরা শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁদের বক্তৃতা শুনতে লাগলাম। সব শেষে ছুটির ঘণ্টা বাজল। সবাই আমরা নূতন অভিজ্ঞতা নিয়ে ক্লাসের বাইরে এলাম।

দুটি বিষয়ের নূতন অভিজ্ঞতা সেদিন আমাকে এবং আমার বন্ধুদের মন ভরিয়ে দিয়েছিল। কলেজে প্রতি পিরিয়ডেই রোল কল হয়; আমাদের স্কুলে কিন্তু তা হত না। দ্বিতীয়তঃ কলেজে অধ্যাপক মহাশয়গণ ঘণ্টা পড়ার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লাসে চলে আসেন। তাঁরা সকলেই দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন; এমনকি অধ্যক্ষ মশাইও সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভাষণ শুনতে শুনতে আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কলেজের বৃহত্তর পরিবেশেও যে এতখানি আন্তরিকতার উষ্ণ স্পর্শ লাভ করব, তা ভাবতে পারিনি।

কলেজে আমার এই প্রথম দিনটি আমার সারাজীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। কলেজে যাওয়ার পূর্বে কলেজ সম্পর্কে এত কথা ভেবেছি—এত ভয় পেয়েছি; কিন্তু কলেজে গিয়ে দেখলাম যে এ জীবনে নূতন উদ্দীপনা আছে—নূতন জীবনের সোপান-পথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলব ভবিষ্যতের লক্ষ্যপথে। এই দিনটি আমার জীবনে এত মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও প্রতিশ্রুতি এনে দিয়েছে—আমি আপনাকে এই দিনটির স্মৃতি না জানিয়ে পারছি না।

আমি ভাল আছি। আপনি এবং মা আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। দীপুকে আমার আদর ও ভালবাসা দেবেন। এবার বাড়ি যাওয়ার সময় ওর জন্য দু'খানা গল্পের বই নিয়ে যাব। শ্রীচরণে প্রণাম জানাই। ইতি—

আপনার স্নেহের
দিবাকর

প্রতিবেদন রচনা

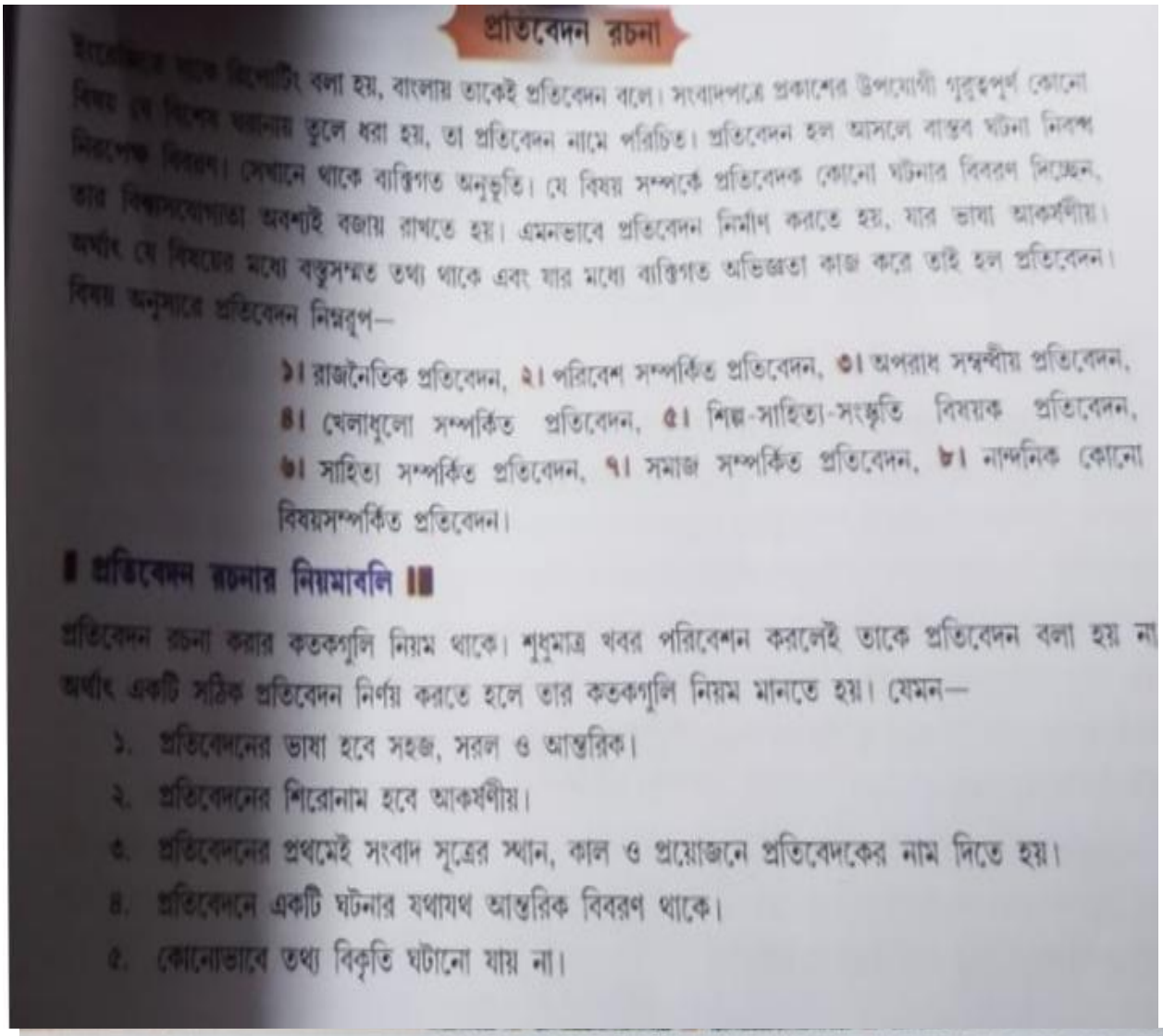

প্রতিবেদন রচনা

ইংরেজিতে যাকে রিপোর্টিং বলা হয়, বাংলায় তাকেই প্রতিবেদন বলে। সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় যে বিশেষ ভাষায় তুলে ধরা হয়, তা প্রতিবেদন নামে পরিচিত। প্রতিবেদন হল আসলে বাস্তব ঘটনা নির্ভর নিরপেক্ষ বিবরণ। সেখানে থাকে ব্যক্তিগত অনুভূতি। যে বিষয় সম্পর্কে প্রতিবেদক কোনো ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন, তার বিশ্বাসযোগ্যতা অবশ্যই বজায় রাখতে হয়। এমনভাবে প্রতিবেদন নির্মাণ করতে হয়, যার ভাষা আকর্ষণীয়। অর্থাৎ যে বিষয়ের মধ্যে বস্তুসম্মত তথ্য থাকে এবং যার মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কাজ করে তাই হল প্রতিবেদন। বিষয় অনুসারে প্রতিবেদন নিম্নরূপ—

১। রাজনৈতিক প্রতিবেদন, ২। পরিবেশ সম্পর্কিত প্রতিবেদন, ৩। অপরাধ সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন, ৪। খেলাধুলো সম্পর্কিত প্রতিবেদন, ৫। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিবেদন, ৬। সাহিত্য সম্পর্কিত প্রতিবেদন, ৭। সমাজ সম্পর্কিত প্রতিবেদন, ৮। নান্দনিক কোনো বিষয়সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

প্রতিবেদন রচনার নিয়মাবলি

প্রতিবেদন রচনা করার কতকগুলি নিয়ম থাকে। শুধুমাত্র খবর পরিবেশন করলেই তাকে প্রতিবেদন বলা হয় না। অর্থাৎ একটি সঠিক প্রতিবেদন নির্ণয় করতে হলে তার কতকগুলি নিয়ম মানতে হয়। যেমন—

১. প্রতিবেদনের ভাষা হবে সহজ, সরল ও আন্তরিক।
২. প্রতিবেদনের শিরোনাম হবে আকর্ষণীয়।
৩. প্রতিবেদনের প্রথমেই সংবাদ সূত্রের স্থান, কাল ও প্রয়োজনে প্রতিবেদকের নাম দিতে হয়।
৪. প্রতিবেদনে একটি ঘটনার যথাযথ আন্তরিক বিবরণ থাকে।
৫. কোনোভাবে তথ্য বিকৃতি ঘটানো যায় না।
৬. যথাসম্ভব নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হয়।
৭. ব্যক্তিগত অভিমত জানাতে গিয়ে কোনোভাবে চাপিয়ে দেওয়া বক্তব্য বলা চলে না।
৮. প্রতিবেদনের আয়তন সুদীর্ঘ করা যায় না।
৯. একই কথা বারবার বলা যায় না। অর্থাৎ চলে না।
১০. প্রতিবেদন এমনভাবে লেখা যাবে না, যার ফলে জনমানসে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে।
১১. প্রতিবেদনে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় না।
১২. নির্ভরযোগ্য বিবরণ দেওয়াই হল প্রতিবেদনের সবথেকে বড় গুণ।

১. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো : জলা বুজিয়ে, সবুজ ধ্বংস করে আবাসন নয়।

▮ সবুজ ধ্বংসের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ মানুষের বিক্ষোভ ▮■

বিশেষ সংবাদদাতা, দত্তপুকুর, মার্চ ২১ : মানুষের বসত বাড়ি তৈরি করা আবশ্যক— কিন্তু জলা, পুকুর, ডোবা বুজিয়ে আস্তানা নয়। এই সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন দত্তপুকুরের মানুষ। প্রতি বছর একদল মানুষ নিজেদের অর্থ লাভের জন্যে রাতারাতি জলা বুজিয়ে বহুতল বাড়ি নির্মাণে ব্যস্ত।

বারাসাত থেকে দূরবর্তী দত্তপুকুরে এখন মানুষের ভিড় রীতিমতো বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আর সেই সুযোগে বারাসাত, হৃদয়পুর, বিরাটি ও কলকাতা সংলগ্ন প্রমোটাররা চাষের জমি কিনে বাড়ি নির্মাণে ব্যস্ত। এর ফলে বোজানো হচ্ছে পুকুর। কাটা হচ্ছে সবুজ অরণ্যভূমি। দরিদ্র মানুষরা সামান্য কিছু টাকার লোভে জমি-জমা, খানা-খন্দ, পুকুর-ডোবা জমি দেদার বিকিয়ে দিচ্ছে। এমনকি ধানের জমি পর্যন্ত বিক্রি করে স্থানীয় চিট্‌ফান্ডে টাকা জমা রাখছে। ফলে পরিবেশের পরিবর্তন হচ্ছে। এলাকার ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।

এসবের বিরুদ্ধে দত্তপুকুরের অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষরা একজায়গায় হয়েছেন। তারা রীতিমতো মিটিং করে আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন। চারিদিকে পোস্টার টানিয়ে লেখা হয়েছে 'আর সবুজ ধ্বংস নয়', 'আর জলা বোজান নয়'। শিশিরকুমার সাহার নেতৃত্বে একটি ফোরাম গঠন করা হয়। শুভাশিস দত্ত, শিবরাম ভট্টাচার্য, তাপস পাল, আনিসুর রহমান প্রমুখ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এক হয়ে দূষণ মুক্ত পরিবেশ রচনার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছেন।

২। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো :

▮ বাংলার কন্যাশ্রী আজ বিশ্বশ্রী ▮■

নিজস্ব সংবাদদাতা, দ্যা হেগ, ২৩ জুন, ২০১৭ : রাষ্ট্রপুঞ্জের জনপরিষেবা দিবসে নেদারল্যান্ডের দ্যা হেগ শহরে পশ্চিমবঙ্গের 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। ৬২টি দেশের প্রায় ৫৫২টি মনোনয়ন জমা পড়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় সবাইকে পিছনে ফেলে প্রথম পুরস্কারের শিরোপা জয় করে নেয় বাংলার কন্যাশ্রী। পুরস্কার পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলার ৫০ লক্ষ কন্যা এই প্রকল্পের শরিক। তাদের উদ্দেশে এই পুরস্কার উৎসর্গ করলাম'।

সম্মেলনের প্রথম দিন কন্যাশ্রী প্রকল্পটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল টমাস গ্যাশ তাঁর দু-দফার বক্তৃতায় কন্যাশ্রী প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। নাবালিকার বিয়ে রুখতে এবং পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত মেয়েদের স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত করতে এই প্রকল্পের অগ্রণী ভূমিকার কথা বলেন। তখনই এর পুরস্কার প্রাপ্তির দিকটি নিশ্চিত হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মতে, কন্যাশ্রী হল জন পরিসেবায় এক অভিনব পদক্ষেপ। যদিও এই প্রকল্পের প্রথম বার্ষিকীতেই অর্থাৎ ২০১৪ সালের ১৪ আগস্ট রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানে বাংলার শ্রীময়ীদের শিক্ষার দরজা আজ উন্মুক্ত হয়েছে।